মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কথা নয় কাজ অথবা পদত্যাগ

গোলাম মোর্তোজা

‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?’
কুসুম কুমারী দাশ

বেশি কথা বলা জাতি হিসেবে আমাদের একটা পরিচিতি আছে। আমরা কথা বলতে পছন্দ করি, কাজের চেয়ে বেশি তো অবশ্যই। জাতি হিসেবে এটা আমাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবনানন্দ দাশের মা উনিশ শতকের কবি কুসুম কুমারী দাশ আজ থেকে বহু আগে বাঙালির প্রধানতম বৈশিষ্ট্যটি অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার কবিতায়। তার সময়কালের রাজনীতিবিদরাও কথা বলতেন, একটু বেশিই বলতেন। পাশাপাশি যার যে কাজ সেটাও করতেন। তারপরও কাজের চেয়ে কথার পরিমাণ বেশি ছিল বলেই হয়তো কুসুম কুমারী দাশ এ কবিতা লিখেছিলেন।

কিন্তু কুসুম কুমারী দাশ স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তিনি দেখেননি আমাদের রাজনীতিবিদ, মন্ত্রীরা কত বেশি কথা বলেন এবং সেই তুলনায় কত কম কাজ করেন। আমাদের রাজনীতিবিদরা নিজেদের অসততা আড়াল করার জন্য সারাক্ষণ সততার প্রমাণ দেয়ার জন্য ব্যস্ত থাকেন। তারা দেখেন একটা, বলেন অন্যটা। বিশ্বাস করেন একটা, বলেন উল্টোটা। তাদের নিজেদের কোনো দোষ নেই। নিজেরা মনে করেন তাদের অবস্থান প্রায় ফেরেশতার কাছাকাছি।

কুসুম কুমারী দাশের দুর্ভাগ্য যে, তিনি একজন শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়ার কথা শোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তার সৌভাগ্য হয়নি একজন আলতাফ হোসেন চৌধুরী বা মোহাম্মদ নাসিমের কথা শোনার। তারা প্রতিদিন যে নতুন নতুন তত্ত্ব, শব্দ, বাক্যের জন্ম দেন, শব্দ এবং বাক্যের নতুন নতুন অর্থ উদ্ভাবন করেন– এসবের কোনো কিছুই কবি কুসুম কুমারী দেখে যেতে পারেননি!

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনি কালো গ্লাসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে যাতায়াত করেন ঢাকা শহরে। আপনার চোখে থাকে চশমা। চশমার গ্লাস রঙিন। রঙিন চোখ দিয়ে সব কিছুই রঙিন দেখেন। আপনার চোখে সবকিছুই স্বাভাবিক দেখায়। তাই আপনি বলতে পারেন, ‘ধর্ষণ করেছে, আপনারা কী দেখেছেন।’

কম কাজ বেশি কথা এবং অসত্য কথা বলাটাকে আমাদের রাজনীতিবিদরা প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এই শিল্পের ছোঁয়া পেলে নিশ্চয় কুসুম কুমারী দাশের কবিতা আরো অনেক সমৃদ্ধ হতো!

'দেশে খুন বেড়েছে অপরাধ বাড়েনি'– বলেছেন আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। বাংলা ভাষায় তো অবশ্যই, সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসেও এটা একটি নতুন বাক্য। এই বাক্যের অর্থ কী? খুন যে করে সে খুনি– আভিধানিক অর্থ এরকমই হয়। একজন চোর, ডাকাত বা ছিনতাইকারী সমাজে পরিচিত অপরাধী হিসেবে। তবে তার চেয়ে বড় অপরাধী হিসেবে পরিচিত খুনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করছেন খুনির সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু অপরাধ বাড়েনি। তাহলে নতুন এই তত্ত্ব অনুযায়ী খুনি কী অপরাধী নয়?

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী আপনাকে ভোট দিয়ে সম্ভবত মানুষ ভুলই করেছে। হয় কাজ করে মানুষের সেই ভুল ভাঙান, আর না হয় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে মানুষকে মাফ করে দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে যদি আপনার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় তাহলে এগিয়ে আসুন।

'সারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের চেয়ে স্বাভাবিক আছে, দিন দিন আরো উন্নতি হচ্ছে'– এই বাণীও জাতিকে শুনিয়েছেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'আগের চেয়ে' বলতে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ধরে নেই আপনি বিগত আওয়ামী লীগের পাঁচ বছর সময়কালকে বুঝিয়েছেন। আওয়ামী লীগের এই শাসনামলে দেশে মানুষ খুন হয়েছে ১৮,৫৬৩ জন, ধর্ষিত হয়েছিল ১২,৯২৫ জন। আপনার এই পাঁচ মাসে খুন হয়েছে কতজন? সেই হিসাব কী আপনার কাছে আছে? না থাকলে জেনে নিন ১২১৯ জন। ধর্ষিত হয়েছে ৭২০ জন। এর মধ্যে শিশু ১৭১ জন। এবার ঐকিক নিয়মে অংক করে ফেলুন। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরে গড়ে প্রতিদিন খুন হয়েছে ১০ জন। আপনার পাঁচ মাসে গড়ে প্রতিদিন খুন হয়েছে ৮ জন। তুলনামূলক আলোচনা করলে সিদ্ধান্তেও পৌঁছে যেতে পারবেন। এখন সামান্য পিছিয়ে থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যে আপনার এগিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রেও বলা যায় একই কথা।

বিগত পাঁচ বছরের আওয়ামী লীগের শাসনামলকে কোনোভাবেই আমরা বলতে চাই না যে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো ছিল। সেটা বলার সুযোগ নেই, একেবারেই নেই। সারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হয়েছে। সাপ্তাহিক ২০০০ সহ দেশের প্রায় প্রতিটি পত্র-পত্রিকা সে খবর প্রকাশ করে আওয়ামী লীগকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছে। আওয়ামী লীগ সরকার সেদিকে নজর দেয়নি। অনেক সময় 'ড্যামকেয়ার' মনোভাব নিয়ে কাজ করেছে। কখনো কখনো সন্ত্রাস-সন্ত্রাসীকে রাষ্ট্রীয় শেল্টার দিয়েছে। মূলত সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়েই ক্ষমতা ছাড়া হয়েছে আওয়ামী লীগ। বিএনপির বিজয় যতটা না বিএনপির কৃতিত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা। একথা বিএনপি'র অনেক নেতাও স্বীকার করেন। এ কথা ক্ষমতার প্রথম দিকে বিশ্বাস করতেন আলতাফ হোসেন চৌধুরীও। সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত ২৬ অক্টোবর সংখ্যায় দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'মানুষ বিএনপিকে ভোট দেয়নি, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণের রায় পেয়েছি।' অর্থাৎ সন্ত্রাস নির্মূল না হলেও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিএনপিকে মানুষ ভোট দিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতেন, 'চল্লিশ হাত মাটির নিচে থেকে হলেও সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হবে।' তিনি সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি, করেননি। কারণ চল্লিশ হাত মাটির নিচে কোনো সন্ত্রাসী থাকতো না। সন্ত্রাসীরা থাকতো পাড়া-মহল্লায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, তার আশপাশে কখনো কখনো সঙ্গে। মোহাম্মদ নাসিমের পুলিশ অধিকাংশ সময় সন্ত্রাসীদের পাহারা দিয়েছে, গ্রেপ্তার করেনি।

মানুষ অনেক আশা নিয়ে নয়, নিরুপায় হয়ে ভোট দিয়েছে বিএনপিকে। মানুষ মনে করে না যে সরকার তার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। সরকারের কাছে মানুষের চাওয়া খুবই সামান্য। বাবা তার মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে ফিরে আসার নিশ্চয়তা চায়। ব্যবসায়ী সঠিকভাবে ব্যবসা করে উপার্জন করতে চায়। চাঁদা দিতে গিয়ে তাকে যেন সর্বস্বান্ত হতে না হয় সেই নিশ্চয়তা চায়। মানুষ আশা করেছিল 'ঠেকে শেখা' বিএনপি সরকার তাদের আশার কিছুটা হলেও পূরণ করতে সক্ষম হবে। মানুষের জন্য কিছু কাজ অন্তত করবে। কিন্তু মানুষ দেখছে বিএনপি সরকার অতীত থেকে কিছু শেখেনি। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সত্য এই যে, মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। বিএনপিও এর বাইরে নয়। বিএনপি তথা চারদলীয় জোট সরকার কথা দিয়েই যুদ্ধ জয় করতে চাইছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী। তিনি বলছেন, 'মানুষের মধ্যে আতঙ্ক নেই, অস্বস্তি আছে।' মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আতঙ্ক এবং অস্বস্তির ব্যাখ্যা কী?

ঢাকার নিউ ডিওএইচএস এলাকায় থাকেন ইশতিয়াক আহমেদ। বড় মেয়ের পরীক্ষা, গাড়ি নিয়ে গেছেন। ছোট মেয়েকে বেবিট্যাক্সিতে স্কুলে পাঠাতে সাহস করছেন না। বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মিরপুরের ফাহিমার ছবি। নিজের অজান্তেই ফাহিমার স্থানে চলে আসছে নিজের মেয়ের ছবি। এটাকে কী বলে আতঙ্ক না অস্বস্তি?

এতো গেল গাড়িওয়ালাদের কথা। মতিঝিলের একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করেন সুলতানা জামান। থাকেন কমলাপুরে। কখনো হেঁটে, কখনো রিকশায় যাতায়াত করেন। কখনো কখনো সন্ধ্যার পরেও অফিস থেকে বের হন। ইদানীং রাস্তায় বের হলেই দেখছেন কিছু লোক তার পিছু নেয়। অশোভন উক্তি এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের কাছে একদিন নালিশও করেছেন। দুই পুলিশ একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসি বিনিময় করেছে। সেই হাসি ছিল বখাটে মাস্তানদের অশ্লীল আচরণের চেয়ে অনেক বেশি অশ্লীল।

সুলতানা জামান কী অস্বস্তিতে আছেন না আতঙ্কে আছেন? মহাখালী থেকে টেম্পোতে ফার্মগেট আসছিল রং মিস্ত্রী মতিন মিয়া। টেম্পো ছাড়তেই দুইজন সন্ত্রাসী চাকু বের করল। মতিন মিয়ার সঙ্গে থাকা তিন হাজার টাকা নিয়ে নিল তারা। মতিন মিয়া ছাড়া যাত্রীরূপী আর সবাই ছিল ছিনতাইকারী। ফার্মগেটের একটু দূরে ছিনতাইকারীরা মতিন মিয়াকে নামিয়ে দিল। দৌড়ে এসে ফার্মগেট ওভার ব্রিজের পাশে দাঁড়ানো

সার্জেন্টের কাছে তার সর্বস্ব হারানোর কাহিনী বলল, বলল টেম্পোর নম্বর। ততক্ষণে টেম্পো খুব বেশি হলে বাংলামোটর মোড়ে এসে পৌঁছেছে। সার্জেন্ট ইচ্ছে করলেই মোটরসাইকেল নিয়ে গিয়ে ধরতে পারতেন টেম্পোটি। অথবা ওয়ারলেসে পরবর্তী মোড়ের সার্জেন্টকে বিষয়টি জানাতে পারতেন। কিন্তু তেমন কিছু করলেন না। সার্জেন্ট মতিন মিয়াকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'আপনি চিৎকার না করে খুবই ভালো করেছেন। তা না হলে ছিনতাইকারীরা আপনাকেই ছিনতাইকারী বলে পেটাতো। গণপিটুনিতে আপনি মারাও যেতে পারতেন।'

আলতাফ চৌধুরীর পুলিশের এমন জ্ঞানের কথা শুনে মতিন মিয়ার মনের অবস্থা কী হয়েছে? আমরা যখন তার সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিন মিয়া কী অস্বস্তিতে কাঁপছেন, না আতঙ্কে?

এখানে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এর কোনোটিই বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। বর্তমান সময়ের সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এই ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে। ১৩ কোটি মানুষের প্রায় ৯৫%-এর প্রতিনিধি একজন ইশতিয়াক আহমেদ, সুলতানা জামান বা মতিন মিয়া। খুলনার সাংবাদিক হারুনার রশীদ খোকন, মিরপুরের ফাহিমা রাজশাহীর মহিমা– এদেরই ভাই বোন বা সন্তান। এরা জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন গণতান্ত্রিক সরকারের দেওলিয়াপনার। এদেরই পরিচিতি সাধারণ মানুষ হিসেবে, ভোটার হিসেবে। পাঁচ বছরে একবার যাদের কাছে যেতে হয় রাজনীতিবিদদের। মোহাম্মদ নাসিমের আমলেও তারা এমনই ছিলেন। আলতাফ চৌধুরীর আমলেও তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। মাঝখানে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তিন মাস সময়কালে তারা স্বস্তিতে ছিল, শান্তিতে ছিল।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনি কালো গ্লাসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে যাতায়াত করেন ঢাকা শহরে। ঢাকার বাইরে যান জনগণের মাথার ওপর দিয়ে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে। আপনার চোখে থাকে চশমা। চশমার গ্লাস রঙিন। রঙিন চোখ দিয়ে সব কিছুই রঙিন দেখেন। আপনার চোখে সবকিছুই স্বাভাবিক দেখায়। তাই আপনি বলতে পারেন, 'ধর্ষণ করেছে, আপনারা কী দেখেছেন।' আপনার কথায় মনে হয় ধর্ষকরা ধর্ষণ করে জনসম্মুখে, সাক্ষী প্রমাণ রেখে!

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী আপনি বিমান বাহিনীর মতো একটি নিয়মিত বাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে চাকরি করেছেন। যেখানে কর্মরতদের জনগণের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকে না। হঠাৎ করে রাজনীতিতে এসেই আপনি জনমানুষের সঙ্গে মিশে যাবেন এমনটা আশা করাটাও বোকামি। 'কে এমপি কে টোকাই পার্থক্য বোঝা যায় না'– আপনার মুখে এমন উক্তি শুনে 'বোকা জনগণ' অবাক হয়। আপনার পক্ষে যে এটা বলা স্বাভাবিক এটা মোটেই তারা বুঝতে চায় না।

সন্ত্রাসী টোকাই সাগর পল্টনের বিএনপি অফিসের ভেতরে আপনার নেতা জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতির সামনে বসে সাক্ষাৎকার দিল। বিএনপি অফিসের সামনে তখন শ'খানেক পুলিশ ছিল। আপনি এবং আপনার পুলিশ যে 'টোকাই সাগরদের' চিনতে পারেন না দুষ্টু লোকেরা এটা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বলতে চায় বিএনপি করার কারণেই আপনার পুলিশ 'টোকাই সাগরদের' গ্রেপ্তার করে না। আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন কথা দিয়ে মানুষের ভুল ভাঙাতে। সেটা 'বাচাল'-এর পর্যায়ে চলে গেলেও বোকা জনগণ আপনার কথা বিশ্বাস করতে বা বুঝতে অক্ষম।

মোহাম্মদ নাসিমের পুলিশ রাস্তার নেতা সাদেক হোসেন খোকাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। রক্তে তার শরীর, পোশাক সবই ভিজে গিয়েছিল। নাসিম বলেছিলেন, খোকা রঙ লাগিয়ে অভিনয় করেছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে মনি বেগমের পরনের কাপড় টেনে খুলে ফেলেছিল পুলিশ।

আলতাফ চৌধুরীর পুলিশ রাস্তায় পিটিয়ে শুইয়ে ফেলেছে মোহাম্মদ নাসিমকে। লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে এবং গায়ে হাত দিয়ে লাঞ্ছিত করেছে মতিয়া চৌধুরীকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর মনোভাব এমন, যেন তেমন কিছুই হয়নি। পুলিশের পেটানোটা রুটিন ওয়ার্ক। এমপি আর টোকাইয়ের পার্থক্য বোঝা না গেলে পুলিশের কী দোষ!

আলতাফ চৌধুরী বারবার বলতে চাইছেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে উন্নতির বন্যা বইছে। কিন্তু ৯ মার্চের সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া বললেন ভিন্ন কথা। তিনি সরাসরি স্বীকার করলেন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দাবি করলেন, 'বিরোধী দল পরিকল্পিতভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। একজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি সব ফাঁস করে দিয়েছেন।' প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দল বলতে বুঝিয়েছেন আওয়ামী লীগকে। আর গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিটি হচ্ছেন বাহাউদ্দিন নাসিম। খালেদা জিয়ার দাবি অনুযায়ী সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, দখল, ধর্ষণ সবই করছে আওয়ামী লীগ। এ সবই করছে পরিকল্পিতভাবে। এবং এই পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত বাহাউদ্দিন নাসিম। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিমের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে একথা সত্যি। ক্ষমতার পাঁচ বছরে তিনি নিঃস্ব থেকে কোটিপতি হয়েছেন। ৪০ লাখ টাকার গাড়িতে চড়েন তিনি। ঢাকায় একাধিক বাড়ি এবং ফ্ল্যাট কিনেছেন নামে এবং বেনামে। আমেরিকায়ও তিনি বাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান সরকার কী বাহাউদ্দিন নাসিমের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই অভিযোগগুলোর যথাযথ তদন্ত করবে? সত্যটা মানুষকে জানাবে? বাস্তবতা বলে, এসবের কোনো কিছুর তদন্ত হবে না। মানুষ কোনো দিনই সত্যটা জানতে পারবে না। কারণ এই সত্যটা মানুষকে জানালে আরো অনেক সত্য বের হয়ে আসতে চাইবে। বাহাউদ্দিন নাসিমের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, প্রায় প্রত্যেক রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধেই সেই অভিযোগ। কার তদন্ত কে করবে?

'দেশে খুন বেড়েছে অপরাধ বাড়েনি'– বলেছেন আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। বাংলা ভাষায় তো অবশ্যই, সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসেও এটা একটি নতুন বাক্য

খালেদা জিয়া যখন বিরোধী দলে ছিলেন, শেখ হাসিনা তখন প্রধানমন্ত্রী। দেশে প্রতিদিন দশজন মানুষ খুন হচ্ছে। বোমা বিস্ফোরণ একটি নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তখন শেখ হাসিনা তার প্রতিদিনের বক্তৃতায় বলতেন, বিরোধী দলের শেল্টারে মৌলবাদীরা সন্ত্রাস করছে। বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ মারছে। কিন্তু কোনো মৌলবাদীর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়নি

হাসিনার সরকার। খালেদা জিয়া বলতেন, আওয়ামী লীগ সরকার ব্যর্থ। মানুষ সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্তি চায়। ঠিক এখন হাসিনা যা বলছেন, তখন সেটাই শোনা যেত খালেদার মুখে। আবার একইভাবে এখন খালেদা যা বলছেন, তখন হাসিনাও তাই বলতেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি বলছেন, বিরোধী দল সন্ত্রাস করছে পরিকল্পিতভাবে। কিন্তু আপনার সরকার কী করছে? সন্ত্রাস যারা করছে পরিকল্পিতভাবে তাদের ধরছেন না কেন? আপনার সরকারের কাজ এতো অপরিকল্পিত-অগোছালো কেন? আপনার সরকারের এখন যে অবস্থা সেই অবস্থা যদি '৯১ সালে দেখা দিত, তাহলে মানুষ এতোটা অবাক হতো না। কারণ সেই সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনি ছিলেন নতুন। সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতায় আপনার যেমন ঘাটতি ছিল, তেমনি ঘাটতি ছিল বিএনপি'র নেতা-মন্ত্রীদেরও। স্বাভাবিকভাবেই তো '৯১-এর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যাওয়ার কথা ছিল ২০০১ সালে গঠিত সরকারে। কিন্তু অভিজ্ঞতার ছোঁয়া তো দেখা যাচ্ছেই না, উল্টো তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, '৯১-এর বিএনপি সরকার বর্তমানের চেয়ে অনেক সংগঠিত ছিল। বিরোধী দলের তুমুল আন্দোলনের মুখে তো প্রথম তিন বছর সেই সরকার খুব ভালোমতোই চলেছিলো। ভুলটা হয়েছিল চতুর্থ বছরে গিয়ে। এবং ফলশ্রুতিতে পতন হয়েছিল সেই সরকারের।

২০০১-এর নির্বাচনের পর বিরোধীদল আওয়ামী লীগ যাচ্ছেতাই রকমের দুর্বল, অগোছালো। আওয়ামী লীগ এখন ব্যস্ত নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে। সেই সংগ্রামের অংশ হিসেবে দু'একটি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা অস্বাভাবিক নয়। অন্তত আমাদের দেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী তো নয়ই। বর্তমান সময়ের দুর্বল আওয়ামী লীগের পক্ষে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশ জুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা সম্ভব কি না সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। তারপরও যদি ধরে নেয়া যায় আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস-নৈরাজ্য করছে, তাহলে সরকারকে তো সেটা মোকাবেলা করতে হবে কঠোরভাবে। শুধু কথা দিয়ে অভিযোগ করে নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে যে তথ্য প্রমাণ আছে বলে দাবি করছেন তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিন।

আপনারা যে ব্যবস্থা একেবারে নেননি তা তো নয়। দেশদ্রোহী বলে শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেপ্তার করেছেন। প্রমাণ হাজির করে আটকে রাখতে পারেননি। করতে পারেননি বিচারের ব্যবস্থা। ফলে আপনাদের অভিযোগের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আপনার সরকারের ইমেজ নষ্ট হয়েছে। সন্ত্রাসের অভিযোগে হাজী সেলিমকে গ্রেপ্তার করেছেন। সেও বেরিয়ে এসেছে। এদেরকে গ্রেপ্তার করার আগে কী তথ্য-প্রমাণ ছিল না? উত্তর হ্যাঁ হলে কোথায় গেল সে তথ্য-প্রমাণ? বাহাউদ্দিন নাসিমকে গ্রেপ্তার করে এত কথা বলছেন, কিন্তু তাকে কি আটকে রাখতে পারবেন? পারবেন না। আপনাদের সব তথ্য-প্রমাণকে অসাড় প্রমাণিত করে বাহাউদ্দিন নাসিম ঠিকই বেরিয়ে আসবে। কারণ আপনাদের কোনো তথ্য-প্রমাণই সঠিক নয়, নির্ভুল নয়। তাহলে কী আপনারাও এখন আওয়ামী লীগের মতো হাইকোর্টের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করবেন? আপনি যে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলছেন তাতে দেখা যাচ্ছে সব কিছুর জন্যই দায়ী বিরোধী দল। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসছে সেই তথ্যের যথার্থতা নিয়ে, সত্যতা নিয়ে।

আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরে গড়ে প্রতিদিন খুন হয়েছে ১০ জন। আপনার পাঁচ মাসে গড়ে প্রতিদিন খুন হয়েছে ৮ জন। তুলনামূলক আলোচনা করলে সিদ্ধান্তেও পৌঁছে যেতে পারবেন। এখন সামান্য পিছিয়ে থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যে আপনার এগিয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কী তথ্য আছে আপনার কাছে। আপনি কী জানেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছাত্রলীগের কোনো সন্ত্রাসী নেই? তারা কিছু পালিয়েছে, কিছু আপনার ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলে যোগ দিয়েছে। চাঁদাবাজি, মাস্তানি, ফাও খাওয়া, সাধারণ ছাত্রদের চড়-থাপ্পড় মারার কাজটি এখন ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরাই করছে।

লালবাগে এখন হাজী সেলিম নেই, সন্ত্রাস আছে। আপনার অছাত্র 'ছাত্রনেতা' পিন্টু এমপি হাজী সেলিমের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। হাজী সেলিমের সন্ত্রাসীদের অনেককেই এখন দেখা যায় পিন্টুর সঙ্গে।

ধানমন্ডিতে মকবুল নেই, নেই তার সন্ত্রাসী পুত্রগণও। কিন্তু সন্ত্রাস কী নেই? আছে। মকবুলের সন্ত্রাসীদের অনেকেই এখন বিএনপি'র সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত।

নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমান না থাকলেও প্রায় বিশজন ছাত্রদল, যুবদল, বিএনপি সন্ত্রাসী দখল, চাঁদাবাজি, মাস্তানি করছে। জাকির খান, ডেভিড সবাই নিজেকে ভাবছে শামীম ওসমান। লক্ষ্মীপুরে তাহের নেই, আছে সাহাবুদ্দিন সাবু। লক্ষ্মীপুরবাসী যার মধ্যে দেখছে ভবিষ্যতের তাহেরকে।

এমন উদাহরণ আরো অনেক দেয়া যায়। তাতে শুধুই পৃষ্ঠা বাড়বে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলছেন, কোথাও বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না। কিন্তু সত্য হলো, বিশৃঙ্খলা রয়েছে সর্বত্রই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি সন্ত্রাস দমনের জন্য নতুন আইন করার কথা ভাবছেন। সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ করেছিলেন '৯২ সালেও। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে জননিরাপত্তা আইন করেছিলেন। কোনো আইনের জোরেই সন্ত্রাস দমন হয়নি। আপনি হয়তো সে কথা ভুলে গেছেন।

বাংলাদেশ যত পেশার লোক আছে তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ। ঘুষ খাওয়া থেকে শুরু করে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজগুলো পুলিশই করে। সেই পুলিশের হাতে নতুন আইন তুলে দিলে সেটা সরকারের কী উপকারে আসবে? জননিরাপত্তা আইনে পুলিশ গত পাঁচ বছরে আপনাদের নেতা-কর্মীদের নামে ৮,২৪১টি কেস করেছিল। এর মধ্যে সন্ত্রাসীর সংখ্যা বেশি ছিল না। যারা সন্ত্রাসী ছিল তাদেরকেও আপনারা ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছেন। আপনাদের করতে যাওয়া নতুন আইন দিয়েও পুলিশ এমনই করবে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নামেই কেস করবে। সন্ত্রাসীদের নামে নয়।

আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ভারতের কলকাতা। তারা সন্ত্রাস মোকাবেলার জন্য নতুন একটি আধুনিক বিশেষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে। গড়ে তুলছে আধুনিক পুলিশ বাহিনী। নতুন কোনো আইন করছে না। আর আমরা অসৎ দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ বাহিনীর হাতে তুলে দিচ্ছি

'কালাকানুন'। কিন্তু একটি বিশেষ আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার কথা ভাবছি না। আসলে কলকাতার বামফ্রন্ট সরকার সত্যি সত্যি সন্ত্রাস নির্মূল করার অঙ্গীকারে বিশ্বাসী। বিরোধী দলকে শায়েস্তা করাটা তাদের উদ্দেশ্য নয়। আর আমাদের সরকার সন্ত্রাস নির্মূলের অঙ্গীকারে বিশ্বাসী নয়। তারা কালাকানুন তৈরি করে বিরোধী দলকে শায়েস্তা করতে চায়।

নিজের ত্রুটি দূর না করে অন্যের ত্রুটির কথা বলা যায় না। বললে মানুষ হাসে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যখন সন্ত্রাসের জন্য পুরোপুরিভাবে আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন, আলতাফ চৌধুরী যখন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে দাবি করেন– তখন মানুষের হাসা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। তবে এই হাসি আনন্দের নয়। মানুষের পরানের গহীন থেকে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা আর হাহাকার বেরিয়ে আসে এই বাঁকা হাসির মধ্য দিয়ে।

এখন সর্বত্রই একটি আলোচনা যে, কোনো কিছুর ওপরেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। আসলে বাস্তবতা হলো পাঁচ মাস বয়সী সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে কোনো কিছুর ওপর এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই করতে পারেনি। কাজ না করে শুধু কথা দিয়েই এখন সরকার সবকিছু ঠিক রাখতে চাইছে। বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একাধারে অনর্গল অর্থহীন কথা বলে চলেছেন। আবার হুমকিও দিচ্ছেন। আজকের কাগজের সাংবাদিক তাজ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের স্ত্রী (নাম প্রকাশ না করে) একটি দুর্নীতির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার রিপোর্টে। মোহাম্মদ নাসিম বলেছিলেন, 'কুত্তার বাচ্চা সাংবাদিককে আমি দেখে নেব।' বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল তখন মোহাম্মদ নাসিমের এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। আর বর্তমান বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী প্রথম আলোর সাংবাদিক পারভেজ খানকে বলেছেন, 'স্টুপিড,... তোমার কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।... তোমাকে আমি সাংবাদিকতা শিখিয়ে দেব।' মজার ব্যাপার হলো, সাংবাদিক পারভেজ খান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কোনো প্রশ্ন করেননি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বক্তব্যের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন শুধু। সেমিনারের বক্তৃতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে বৈধ-অবৈধ দু'ভাবেই ভারত থেকে ফেনসিডিল আসছে।' বৈধভাবে ফেনসিডিল আসা বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন সেটাই জানতে চেয়েছিলেন সাংবাদিক পারভেজ খান। কারণ যারা একটু খোঁজ-খবর রাখেন তারা সবাই খুব ভালো করে জানেন যে, সমগ্র ভারতের কোথাও এখন ফেনসিডিল নামে কোনো ওষুধ বৈধভাবে তৈরি হয় না। যে জিনিস বৈধভাবে তৈরি হয় না সেই জিনিস বৈধভাবে আমদানি হয়ে আসবে কীভাবে?

মাননীয় আলতাফ হোসেন চৌধুরী আপনি এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এক সময় বিমানবাহিনী প্রধান ছিলেন– এর অর্থ তো এই নয় যে, আপনি সব কিছুই জানেন। আপনার পদমর্যাদার একজন মানুষকে তো দায়িত্বশীল হতে হয় বলেই আমরা জানি। আপনি ভুল, অসত্য তথ্য দিয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন না। তারপরও অসতর্কতার কারণে যদি ভুল তথ্য বক্তব্যে এসে যায়, সেটা শোধরানোর দায়িত্ব আপনার। ব্যাখ্যা জানতে চাওয়াটা সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্ব। সাংবাদিককে 'স্টুপিড' বললে, 'সাংবাদিকতা শেখাতে' চাওয়ার হুমকির মধ্য দিয়ে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও।

জয়নাল হাজারী যখন সংসদে দাঁড়িয়ে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান প্রসঙ্গে অশ্লীল, অসত্য বক্তব্য রেখেছিল সেদিন আওয়ামী লীগের কোনো নেতা হাজারীকে থামানোর চেষ্টা করেনি। আলতাফ হোসেনের এই দাম্ভিকতা নিয়েও বিএনপির কোনো নেতা বা প্রধানমন্ত্রী কিছু বলছেন না। মোহাম্মদ নাসিম বা হাজারীর দাম্ভিকতার মূল্য আওয়ামী লীগকে কতটা দিতে হয়েছে সেটা বিএনপি নেতা-কর্মীরা সবচেয়ে ভালো জানেন। নিজেদের দাম্ভিকতার মূল্য কতটা দিতে হবে সেটা তারা একবারও ভেবে দেখছেন না।

শেখ হাসিনা বেশি কথা বলেন এবং খালেদা জিয়া কম কথা বলেন– এটাই ছিল এতদিন আমাদের রাজনীতির বাস্তবতা। শেখ হাসিনার বেশি কথা বলার কারণে আওয়ামী লীগ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একথা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে বলতে না পারলেও স্বীকার করেন। খালেদা জিয়ার কম কথা বলা নিয়েও সমালোচনা ছিল। কিন্তু হাসিনার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে খালেদা জিয়ার এই কম কথা বলাটা প্রশংসিতই হয়েছে। কিন্তু গত ৯ মার্চের সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া যে ভাষায় কথা বলেছেন, সেটা দেখে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি ঢালাওভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য বিরোধীদলকে দায়ী করেছেন। তার এই কথা বলার ধরন দেখে মানুষ শেখ হাসিনার কথা মনে করেছে বারবার। যেন খালেদা জিয়ার মুখ দিয়ে শেখ হাসিনার কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন মানুষ। খালেদা জিয়া এখন যে কথাগুলো বলছেন, সেই কথাগুলোই যদি দুই বা তিন বছর পরে বলতেন তাহলে হয়তো বাস্তবতা থাকতো। কারণ অভিজ্ঞতা বলে এই সময় নাগাদ বিরোধী দল সরকারবিরোধী আন্দোলন নিয়ে মাঠে থাকবে। স্বাভাবিকভাবে সরকারকে বিব্রত করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সবই করবে। এর অর্থ এই নয় যে, বিরোধী দল এখন কিছু করছে না বা করার চেষ্টা করছে না। নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন হয়েছে। বিরোধী দল এর সুফলটা নিতে চেয়েছে, নিয়েছে। বিরোধী দলে বিএনপি থাকলেও তাই করতো। জোট সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করতে গিয়ে সবকিছু ঘোলাটে করে ফেলেছে। আর এ ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ডিসি-এসপিদের রিপোর্টকেই তিনি 'বেদবাক্য' মনে করেছেন। সংবাদপত্রের সত্য ঘটনাকে তিনি বলেছেন মিথ্যা বা অর্ধসত্য। ডিসি-এসপিরা নিজেরা ভালো থাকার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অসত্য তথ্য দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই অসত্য তথ্য মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে সরকার এবং জনগণ সবাই বিভ্রান্ত হয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু ঘটনা অর্ধসত্য ধরে নিলেও প্রমাণ হয় কিছু ঘটেছে। কিন্তু এগুলোর

আলতাফ চৌধুরী যখন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে দাবি করেন– তখন মানুষের হাসা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। তবে এই হাসি আনন্দের নয়। মানুষের পরানের গহীন থেকে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা আর হাহাকার বেরিয়ে আসে এই বাঁকা হাসির মধ্য দিয়ে।

কয়টি তদন্ত করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? কয়টি ঘটনার জন্যে শাস্তি দিয়েছেন তার দলের নেতা-কর্মী-সন্ত্রাসীদের?

সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা না করে সঠিক তদন্ত করলে যে তথ্য বেরিয়ে আসতো তার থেকে সরকারই লাভবান হতো সবচেয়ে বেশি। কারণ সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের জন্য বিএনপির কিছু নেতা-কর্মী ও সন্ত্রাসীরা যেমন দায়ী, তেমনি আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী-সন্ত্রাসীরাও নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই সত্যটা বিএনপি বের করতে পারেনি। এছাড়া নির্বাচনের পরপরই বিএনপির অনেক নেতা গজিয়ে উঠেছিল। যারা পূর্বে কখনই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। মূলত এই নব্য বিএনপিই নির্যাতন করেছে। তারা শুধু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করেনি, সংখ্যাগুরু দরিদ্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর ওপরও নির্যাতন করেছে। বিএনপি সরকার বা নেতারা এই নব্য বিএনপিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘটনা আড়াল করার মানসিকতায় তারা আরো উৎসাহ পেয়েছে। মূলত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির সূচনা হয়েছে এই সময় থেকেই। যার ধারাবাহিকতায় আজ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির কথা স্বীকার করতে হচ্ছে। এখন প্রধানমন্ত্রীর শুধু বিরোধী দলকে দোষ দেয়ায় বিএনপি সন্ত্রাসীরা উৎসাহ পাবে বলে শেখ হাসিনা যে অভিযোগ করেছেন সেটাকে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। এতে বিএনপির সন্ত্রাসীরা মনে করতেই পারে সরকার তাদের কিছু বলছে না। উৎসাহ পেয়ে সন্ত্রাসের মাত্রা বেড়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য বিরোধী দলকে যত দোষই দেয়া হোক না কেন, এর দায়দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। সরকারের অংশ হিসেবে এর মূল দায় পড়বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপরেই।

আপনি ভুল, অসত্য তথ্য দিয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন না। তারপরও অসতর্কতার কারণে যদি ভুল তথ্য বক্তব্যে এসে যায়, সেটা শোধরানোর দায়িত্ব আপনার। ব্যাখ্যা জানতে চাওয়াটা সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্ব। সাংবাদিককে 'স্টুপিড' বললে, 'সাংবাদিকতা শেখাতে' চাওয়ার হুমকির মধ্য দিয়ে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই অবস্থায় একটি গুজব আলোচনায় আছে। সেটা হলো এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ সরকার। আলোচনায় থাকলেও আমরা এটাকে গুজব হিসেবেই ভাবতে চাই। এই তৃতীয় শক্তির শাসনে দেশ পিছিয়ে গেছে অনেক বছর। 'প্রিয় দেশবাসী' বলে এগিয়ে আসা কোনো ত্রাণকর্তার মাধ্যমে যে মানুষের মুক্তি আসবে না, সেটা দেশবাসী খুব ভালো করেই জানে। এই কারণে বর্তমান গণতান্ত্রিক বিএনপি সরকারের সফল হওয়া প্রয়োজন। যতটা না বিএনপির জন্য তার চেয়ে বেশি দেশের জন্য, তার চেয়েও অনেক বেশি গণতন্ত্রের জন্য। এর জন্য শুধু কথায় নয়, কাজে গণতন্ত্রের প্রকাশ থাকতে হবে। আওয়ামী সংসদ সদস্য তানজীব সোহেল তাজ তার অঞ্চলে সংগঠিত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে যখন অনশন করতে আসবেন তখন তার প্রতি গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাতে হবে। তার মাইক কেড়ে নেয়া, কর্মীদের তাড়িয়ে দেয়া, লাঠিপেটা করার মধ্যে আর যাই হোক, গণতান্ত্রিক মানসিকতা প্রকাশ পায় না। বিএনপিকে সংসদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। চারদলীয় জোটের মোট সদস্য সংখ্যা ২২০ জন। এর মধ্যে শুধু বিএনপিরই ১৮০ জন। অথচ এর মধ্যে ৬০ জনও প্রতিদিন সংসদে যান না। অথচ মন্ত্রীর সংখ্যাই ৬০ জন। উদ্যোগটি নিতে হবে খালেদা জিয়াকেই। খালেদা জিয়া সংসদে গেলে নিশ্চয়ই তার মন্ত্রী, এমপিরা সংসদে যাবেন।

কথা না বলে যে কাজ করা যায় বিএনপি মন্ত্রিসভায়ও তার প্রমাণ রয়েছে। স্বাধীনতার পর সম্ভবত এবারই প্রথম স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ঠিক সময়ে বই পৌঁছেছে। এই কাজটি যিনি করেছেন তার নাম এহসানুল হক মিলন। তিনি বর্তমান বিএনপি সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিএনপির, দুর্ভাগ্য দেশের– এমন নজির একটি-দুটিই।

অনেকে বলছেন, বিএনপি একসঙ্গে দুই লেজ দিয়ে মশা তাড়াতে গিয়ে এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করছে। দুই লেজের একটি বোঝানো হচ্ছে 'হাওয়া ভবন'কে। সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই 'হাওয়া ভবন' নানাভাবে আলোচনায় জড়িয়ে পড়ছে। যে কোনো ঘটনা দুর্ঘটনার দায়দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে হাওয়া ভবনের তথা তারেক জিয়ার ওপর।

মন্ত্রী সচিবকে বদলি করে বলছে এটা হাওয়া ভবনের নির্দেশ। সচিব যুগ্ম সচিবকে বদলি করেও দোহাই দিচ্ছেন হাওয়া ভবনের। যার টেন্ডার পাওয়ার কথা নয় সে পাচ্ছে, আর কর্তাব্যক্তি দিচ্ছেন হাওয়া ভবনের দোহাই। এভাবেই দিন দিন বিতর্কিত হয়ে পড়ছেন তারেক জিয়া, হাওয়া ভবন। যদিও তারেক জিয়া জোর দিয়ে বলেছেন, প্রশাসনের কোথাও তিনি হস্তক্ষেপ করছেন না। হাওয়া ভবনের কথা বলে কেউ যদি কোথাও সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে তাহলে যেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়– তারেক জিয়া এ কথাও বলেছেন। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। তারেক জিয়া অসম্ভব সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বিএনপি'র নির্বাচনী অফিস হাওয়া ভবন পরিচালনা করে প্রশংসিত হয়েছেন। দেশের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার কারণে তার ভাবমূর্তিও প্রশ্নের মুখে পড়ছে।

তারেক জিয়াও সম্প্রতি বলেছেন, কথা বেশি না বলে কাজ বেশি করতে হবে। কিন্তু কে শুনছে কার কথা। মন্ত্রিসভার আর কেউ যদি কথা নাও বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একাই যত কথা বলছেন, সেটাই বিএনপি সরকারের ভাবমূর্তি ম্লান করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। খালেদা জিয়ার নিজের কথা কম বলে কাজ যেমন বেশি করতে হবে, তেমনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়েও কাজ করাতে হবে, কথা বলানো নয়। মানুষ এটা ভাবতে চায় না যে, খালেদা জিয়ার বিএনপিকে ভোট দিয়ে তারা ভুল করেছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী আপনাকে ভোট দিয়ে সম্ভবত মানুষ ভুলই করেছে। হয় কাজ করে মানুষের সেই ভুল ভাঙান, আর না হয় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে মানুষকে মাফ করে দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে যদি আপনার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় তাহলে এগিয়ে আসুন। এখনো সময় আছে কাজ করলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা তথা বিএনপি সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা অসম্ভব নয়।